গল্প

কোন এক বসন্তকালে

ইরাজ আহমেদ

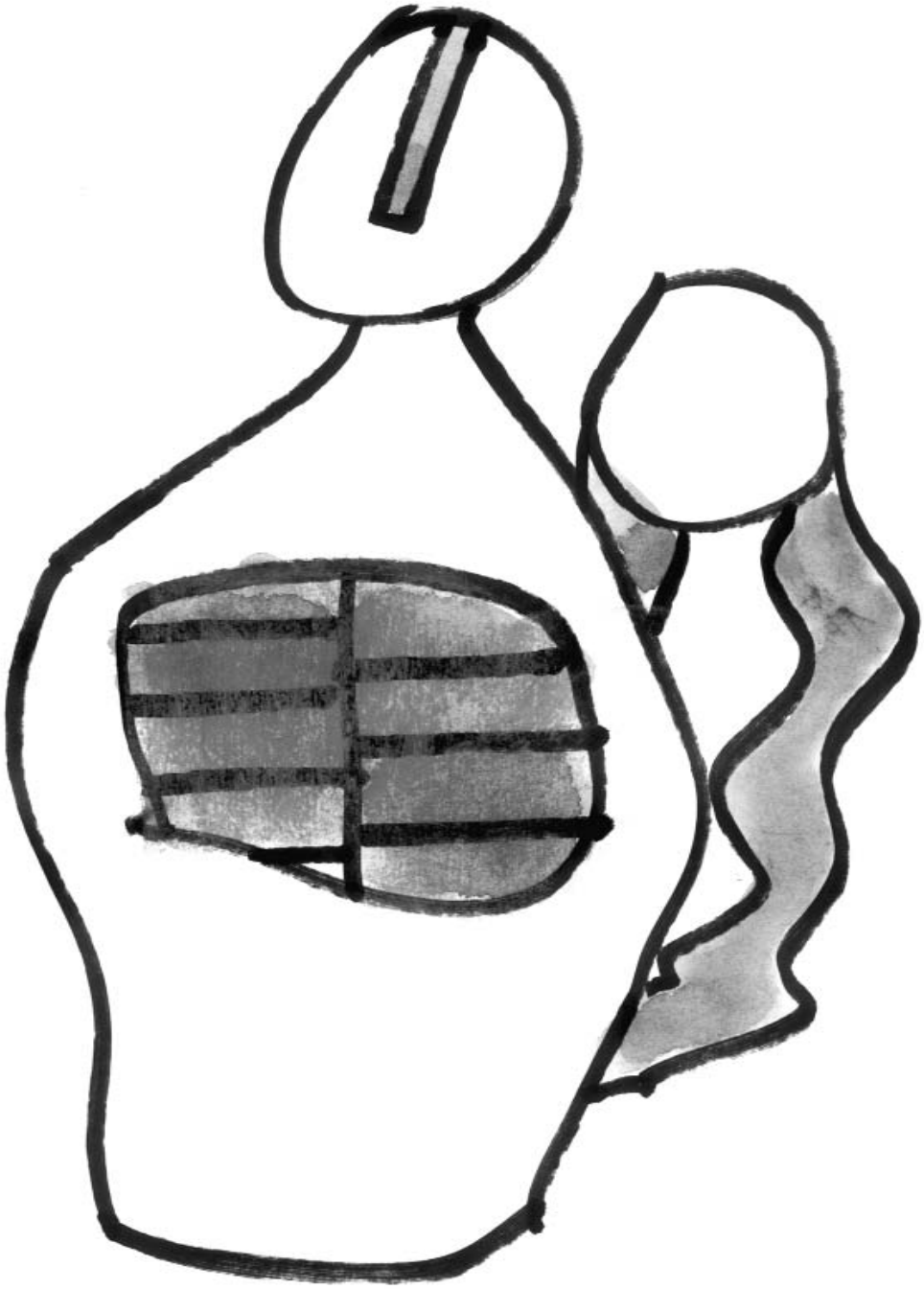

বাসার ভেতরে ঢুকেই মনে হলো এখানে আমার ম্যাজিকের চাইতেও ইন্টারেস্টিং কিছু একটা আছে। বাসাটা পারভেজের এক খালার। পারভেজ আমার ইউনিভার্সিটির বন্ধু। অনেক দিন ধরে বলছে এখানে একদিন ম্যাজিক দেখানোর জন্য। আমার আর সময় হয়ে ওঠে না। আজকাল ম্যাজিক বেশ ভালোভাবেই চেপে ধরেছে আমাকে। মাসে দু - তিনটা শো পড়েই যায়। মাঝে একদিন টিভিতে প্রোগ্রাম করার পর দেখলাম চারদিকে নাম ছড়িয়েছে। কয়েকবার অটোগ্রাফও দিতে হয়েছে। কিন্তু এই ছোট বাসাটার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে প্রায় বিবর্ণ বসবার ঘরে দাঁড়িয়ে মনে হলো এখানে আরও বড় কোন ম্যাজিক আছে। কিন্তু ম্যাজিকটা কি বুঝতে পারছি না। ঘরের একপাশে দেয়াল ঘেঁষে একসেট সোফা। দেয়াল থেকে চুন ঝরে পড়ে সোফার হেলান দেয়ার জায়গাটা সাদা হয়ে আছে। সোফার সামনে একটা কাঠের টেবিল সাদা কভার দিয়ে ঢাকা। ঘরটাতে একটা ছোট খাটও আছে। খাটের পাশে পড়ার টেবিল। ওপরে কয়েকটা বইখাতা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা। সঙ্গে একটা ফুলদানীতে কয়েকটা প্লাস্টিকের ফুল। বিছানার ওপর একটা পত্রিকা খোলা পড়ে আছে। দেখলে বোঝা যায় একটু আগে এখানে কেউ বসে কাগজ পড়ছিলো। আমার আগমন তার পত্রিকা পাঠে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তাড়াতাড়ি যাবার সময় সে একপাটি স্যান্ডেলও ফেলে রেখে গেছে। স্যান্ডেলটা মেয়েদের। ঘরের দেয়ালে এক ভদ্রলোকের লালচে সাদা-কালো একটা ছবি ফ্রেমে ঝুলছে। দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোক দেশ স্বাধীন

হওয়ার আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। ছোট ঘরটার চারপাশে আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আমি খোলা খবরের কাগজটার সামনে বসে পড়লাম। বিছানার পায়ের কাছে একটা খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে। রাস্তায় ছেলেদের ক্রিকেট খেলার চীৎকার। আবারও মাথার ভেতরে ম্যাজিকের কথাটা ফিরে এলো।

ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলে মাঝে মাঝে আমার সময়ের দিকে খেয়াল থাকে না। তারপর আবার আজকের দর্শকরা ফেবারেবল কন্ডিশনে আছে। কখন যে ষাট মিনিট পার হয়ে গেছে টেরই পাইনি। স্টেজে ম্যাজিক দেখানোর সময় দর্শকদের লক্ষ্যই থাকে নতুন ম্যাজিশিয়ানের ভুল খুঁজে বের করা। আজকে এ বাড়িতে একজন ছাড়া আর সবাই আমার ম্যাজিক দেখার আগে আমাকে দেখেই আনন্দিত। মানুষের চোখ দেখলে আমি এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারি। বলা যায় এটা আমার ট্রেডের একটা অংশ। আর ওই যে একজনের কথা বললাম, সে হচ্ছে একপাটি স্যান্ডেলের মালিক। আমার প্রত্যেকটা আইটেম শেষে তার চোখে বিস্ময়ের কোনো ঝিলিক দেখা গেলো না। ব্যাপারটা আমার জন্য খুবই হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সবার সঙ্গে স্যান্ডেলের মালিক যখন ঘরে ঢুকলো এবং খুব গম্ভীর মুখে বিছানার কাছে এসে স্যান্ডেলটা পায়ে গলিয়ে নিলো, তখন ভেতর থেকে কে যেনো বলে উঠলো 'সাদিক এই তোর ম্যাজিক। তাকিয়ে দ্যাখ, অনেকদিন তুই নিজে এরকম ম্যাজিক দেখিসনি।' স্যান্ডেলের মালিক বেশ একটু লম্বা, হালকা-পাতলা। রঙটা চাপা। চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসে হঠাৎ থমকে গেছে। মুখে কেমন একটা নীরবতা ঝুলে আছে। লাল রঙের সাধারণ একটা শাড়ি একটু এলোমেলো করে শরীরে জড়ানো। সে যখন বসবার ঘরে ঢুকলো, দুপুরের রোদ তার পেছনের দরজা দিয়ে বাঁকা হয়ে ঘরের ভেতরে পড়েছে। হঠাৎ মনে হলো একটা লাল জবা ফুল ঘরের ভেতরে কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে। তাকে দেখে মনে হলো এখন এ ঘরে একটা হারমোনিয়াম হলে খুব ভালো হতো। স্যান্ডেলের মালিক গান গাইতো আর আমি শুনতাম। 'আমি তো বুঝি না কবে বরষা, কবে বসন্তের দিন।' কার যেনো গান? ভুলে গেছি।

ম্যাজিক দেখার জন্য অডিয়েন্স ছিলো বড়। অনেকগুলো পিচ্চি আর তাদের মা। ম্যাজিক দেখিয়ে বাচ্চাদের খুশি করা সহজ কথা নয়। বিকেল পার হয়ে গেছে কখন টের পাইনি। উঠে আসার সময় স্যান্ডেলের মালিকের সঙ্গে দরজায় আবার দেখা। পারভেজ সিগারেট কেনার জন্য একটু সামনে এগিয়ে গেছে। ফাঁকা পেয়ে সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম 'আমার ম্যাজিক আপনার ভালো লাগেনি না?' ঠান্ডা চোখ তুলে সে তাকালো আমার দিকে। সে চোখের দৃষ্টিতে তখন সন্ধ্যার গাঢ় রঙ লেগেছে।

'আপনি খুব ভালো ম্যাজিক করেন। কিন্তু আমার যে ম্যাজিক ভালো লাগে না।' সময়টা ছিলো বসন্তকাল। তার কথার সঙ্গে সঙ্গে মাকড়শার পায়ের মতো সরু পুরনো ঢাকার গলিটার ভেতর দিয়ে কেমন একটা হাওয়া বয়ে গেলো। আমি অবাক হয়ে তাকালাম। এরকম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা আমি অনেক দিন শুনিনি।

নাজনিন। মানে সেই স্যান্ডেলের মালিকের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়ে গেলো। পুরানা পল্টনের ফুটপাথে বইয়ের দোকানগুলো আমার কাছে গুপ্তধনের বাক্স। মাঝে মাঝেই ম্যাজিকের ওপর এমন সব বই পাওয়া যায় যা এখন হাজার টাকা খরচ করেও কেনা যাবে না। দোকানগুলোতে উঁকি দিতে দিতে সেদিন হঠাৎ চোখ আটকে গেলো লাইফ অব হুডিনি বইটার ওপর। বইটা হাতে তুলে নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছি। তখনও শহরে বসন্তকাল বিদায় নেয়নি। বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে কেমন একটা ছাড়া ছাড়া হাওয়া। বইটা কিনে ঘুরতেই দেখা হয়ে গেলো নাজনিনের সঙ্গে। পল্টনের গলি থেকে বের হচ্ছে। সেই ঠান্ডা চোখ, কপালের ওপর কয়েকগাছি চুল এসে পড়েছে। টিপটা মুছে যাবার পরেও হালকা লাল রঙ সেখানে লেগে আছে। পরনে সালোয়ার-কামিজ, কাঁধে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ। ভিড়ের মধ্যে খুব অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে হাঁটছে মেয়েটা। তাসের হাত সাফাইয়ের মতো খুব আস্তে ভিড় থেকে বের হয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাজনিন কিন্তু আমাকে দেখে একটুও চমকালো না। ওর ভঙ্গিটা ছিলো এমন, যেনো এরকমই হওয়ার কথা ছিলো।

আরে, আপনি?

নাজনিন আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার কথা বললো। একটু বোকা হয়ে গেলাম। হাতের বইটা সামনে বাড়িয়ে ধরে বললাম, ভালো একটা ম্যাজিকের বই মিলে গেলো।

নাজনিন হাসলো একটু। হাঁটার গতি একটুও না কমিয়ে বললো, আপনার মাথায় কি সারাদিন ম্যাজিক ঘোরে?

আমিও বোকার মতো একটু হেসে বললাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, এখানে কোন কাজে এসেছিলেন?

নাজনিন অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

এক পেয়ালা চা খাবেন? আমার প্রশ্নটা শুনে এবার নাজনিন একটু থামলো। ঘাড় তুলে বিকেলের আকাশটা দেখে নিয়ে বললো, চা? নাহঃ থাক। আরেকদিন খাবো।

ওর আকাশের দিকে তাকানো দেখে খচ করে বুকের ভেতরে কি যেনো বিঁধলো। চোখে কেমন যেনো একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে হঠাৎ বলে ফেললাম, এটা ম্যাজিক টি না, জেনুইন। খেয়ে দেখতে পারেন।

আমার কথা শুনে মুচকি হাসে নাজনিন।

আপনি ম্যাজিশিয়ান তো, তাই সত্যি-মিথ্যা নিয়ে বেশি ভাবেন। আমার আসলে চা খেতে ভালো লাগছে না। অনেকক্ষণ বাসা থেকে বের হয়েছি। আমি বাসায় যাবো।

কথা শুনে একদম বোকা বনে গেলাম। তবু হাসিটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে প্রশ্ন করলাম, আমি আসলে সে পয়েন্ট থেকে কথাটা বলিনি। মনে হলো চা খেতে খেতে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। সেদিন আপনাদের বাসায় কোন কথা হলো না।

নাজনিন ভিড়ের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সম্ভবত বাসের জন্য এদিক-ওদিক তাকায়। মনে হলো আমার কথাটা শোনেনি। তারপর একবার ঘার ঘুরিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে বলে, আসলে আমার ম্যাজিশিয়ানদের ভালো লাগে না। ম্যাজিক দেখিয়ে মানুষকে চমকে দিয়ে কি হয়?

আমার ভেতরে অবাক হওয়ার পালা কেবল বাড়ছে। মেয়েটাকে সেদিনের পর থেকে যেমন যেমন ভেবেছি, ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। এ মেয়ের এরকমই বলার কথা। অনেকটা ম্যাজিকের মতো।

বোধহয় আমাদের দুজনেরই আরও কিছু বলার ছিলো। কিন্তু হুড়মুড় করে বাসটা এলো আর বন্যার পানির মতো নাজনিনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আমার কাছ থেকে। দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ রাস্তায়। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে মনে হলো অফিসে যেতে হবে।

আমি ম্যাজিক শেখা শুরু করেছিলাম বড় চাচার ছেলের কাছ থেকে। বাঙালি মধ্যবিত্তের যা হয় তাসের হাত সাফাইয়ের খেলা। শাহেদ ভাই তাসের ম্যাজিক খুব ভালো জানতেন। কয়েকটা খেলা শিখে কয়েক দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করে দেখলাম ভালোই পারি। তখন আমি কলেজের ছাত্র। খেলাগুলো কলেজে বন্ধু আর বাড়ির লোকের সামনে দেখাতে দেখাতে কেমন একটা নেশা চেপে গেলো। একদিন আমাদের ছোট মফঃস্বল শহরের লাইব্রেরিতে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ পেয়ে গেলাম দি হিস্ট্রি অব ম্যাজিক বইটা। ভিন্ন ধরনের হাত সাফাইয়ের খেলার কৌশল সেখানে দেয়া ছিলো। শিখে ফেললাম। একসময় চলে এলাম ঢাকায়। উদ্দেশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন একটি বিভাগের গলায় মালা পরিয়ে দেয়া। কিন্তু ম্যাজিক আমার পিছু ছাড়লো না। একদিন এক বাসায় হঠাৎ করেই পরিচয় হয়ে গেলো পেশাদার ম্যাজিশিয়ান মাহবুব রানার সঙ্গে। ব্যস, আমাকে আর পায় কে? আমার ভেতরের হুডিনি যাত্রা শুরু করলো। তবে একটা কথা ঠিক যে, ম্যাজিক আমাকে ঝামেলা করেছে অনেক। শেষ পর্যন্ত ম্যাজিকের জন্য এমএ পরীক্ষাটা দেয়া হয়নি। তখন শুধু মনে হতো এসব পড়েটরে কি হবে। বড় ম্যাজিশিয়ান হবো, দেশে দেশে ঘুরবো ম্যাজিক নিয়ে। কিন্তু সেরকম কোন ম্যাজেশিয়ানও হওয়া হয়নি আমার। হয়েছি সাংবাদিক, তাও গ্রেড থ্রি। আর দশটা বাঙালির মতো আধখেঁচড়া করে সব শেষ করেছি। এখন এই প্রায় চল্লিশে না সাংবাদিক না ম্যাজিশিয়ান অবস্থায় ঝুলে আছি একটা সাপ্তাহিক কাগজে। মাস গেলে বাড়িতে মায়ের কাছে কয়েকটা টাকা পাঠাই। মা প্রতি মাসে আমার বিয়ের জন্য একটা করে মেয়ে দেখেন আর আমি ঢাকা শহরে বসে তাইরে নাইরে করে সেগুলো ডজ দিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি গত এক দশকে বুঝে গেছি একজন ব্যর্থ ম্যাজিশিয়ানের আর হাফ সাংবাদিকের জন্য বিয়েটা জরুরি কোন বিষয় নয়।

রুমালের ভেতর থেকে বেড়াল বের হওয়ায় সুকুমার রায় চমকে গিয়েছিলেন কি না জানি না কিন্তু গতকাল দুপুরে আমি চমকে গেলাম। জাদুকররা সাধারণত অন্যকে চমকে দিতে অভ্যস্ত। নিজেরা চমকায় না। কিন্তু আমার বেলায় উল্টো ব্যাপার ঘটলো। আসলে পরে চিন্তা করে দেখলাম আমার মেজাজ খারাপ হয়েছিলো বেশি। সেদিন দুপুরে তেমন কোন কাজ ছিলো না অফিসে। অফিসে সাধারণত লোকজন থাকে কম। মালিকরা সময়মতো বেতনকড়ি দেয় না। ফলে সাংবাদিকরাও মৌসুমী পাখি। আমি হলাম যাকে বলে আঠালি। কুকুরের গায়ে আঠালি পোকা যেরকম লেগে থাকে, আমিও সেরকম পত্রিকাটার সঙ্গে লেগে আছি। যে ক্লাসে একজন ছাত্র, সেই সেখানে ফার্স্ট বয়। আমিও ধুকে ধুকে চলা অফিসটাতে ঠেলেঠুলে আছি ফার্স্ট বয় হয়ে। দুপুর পর্যন্ত কেউ এলোনো দেখে পিওন মিন্টুকে চোখ-কান খোলা রাখতে বলে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম সেগুনবাগিচায় পারভেজের অফিসে। সেখানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে ফেরার সময় দৃশ্যটা দেখে আমি চমকে গেলাম অথবা আমার মেজাজ খারাপ হলো। পল্টনের রাস্তায় একটা রিকশায় নাজনিন যাচ্ছে, তার সঙ্গে বল্টুর মতো চেহারার একটা লোক। লোকটা কালো আর কাঠির মতো সরু। কিন্তু মাথাটা বড়। অদ্ভুত টাইপের লোকটার সঙ্গে নাজনিনকে দেখে আমার ভালো লাগলো না। খুব সাধারণ দৃশ্য। কিন্তু কেন ভালো লাগলো না তা অনেকক্ষণ ধরে আমি ভেবে বের করতে পারলামনা। সন্ধ্যাবেলা অফিসের জানালা দিয়ে পল্টনের মলিন আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। এই জানালাটাকে আমার সবসময় এ অফিসের ওয়েসিসের মতো মনে হয়। এখানে চেয়ার পেতে বসলে অনেক কথা মনে পড়ে। এমন সব কথা মনে পড়ে যা আমি ভুলে থাকতে চাই। অনেক সময় মানুষের এরকম হয়। অনেক দূর পথ কষ্ট করে চলে আসার পর পেছনের পথটার কথা সে সচেতনভাবেই ভুলে থাকতে চায়। বইতে পড়েছি, বসন্তের আকাশ নাকি অন্যরকম হয়। সেখানে চোখ রাখলে মনও অন্যরকম হয়ে যায়। আকাশের রঙই নাকি মনকে অন্যরকম করে দেয়। আমার কিন্তু সেরকম কিছু মনে হলো না। অনেকক্ষণ মেজাজটা খারাপ হয়ে থাকলো। শুনেছি আমাদের মতো যারা হ্যাভ নটস তাদের খামোখাই সবকিছুতে মেজাজ খিঁচে যায়। মনটাকে ঠান্ডা করার জন্য একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে পা তুলে জুত হয়ে বসলাম। নাজনিনের সঙ্গে আমার কি এমন কেনো সম্পর্ক হয়েছে যাতে অন্য একটা লোকের সঙ্গে সে রিকশায় চড়তে পারবে না? মনের ভেতর থেকে একটা বুদ্ধু আস্তে আস্তে বলে, একপাটি স্যান্ডেলের মালিকও হ্যাভ নটস, আবার তুমি হাফ ম্যাজিশিয়ানও হ্যাভ নটস। দুই নটস মিলে কিছু একটা হ্যাভ হয় না? কথাটা উপলব্ধি করে আঁতকে উঠলাম। কেমন একটা প্রেম-প্রেম গন্ধ বের হচ্ছে বলে মনে হয়। ব্যাপারটা মাথা থেকে সরানোর জন্য সিগারেটের আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মিন্টুকে ডাক দিলাম।

জ্বে স্যার।' খুব নৈর্ব্যক্তিক মুখ মিন্টুর। সারাদিন কি যেনো ভাবে ছেলেটা।

ম্যাজিক দেখবি মিন্টু?

আমার প্রশ্ন শুনে মিন্টুর চেহারায় কোন পরিবর্তন হলো না। আমার ম্যাজিক ও অনেক দেখেছে। ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। আমি তবু ফাঁকা থাকলে মিন্টুকে ম্যাজিক দেখাই। ওর ঠান্ডা চোখের মধ্যে সামান্য একটু বিস্ময়ের ঝিলিক খোঁজার চেষ্টা করি।

আজও ড্রয়ার থেকে ছোট্ট একটা বল বের করে হাতের তালুতে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে সেটা নিমিষে উধাও করে দেয়ার পরও মিন্টুর চোখে কোন ধরনের বিস্ময় দেখা গেলো না। হাতের ইশারায় ছেলেটাকে বিদায় করে দিয়ে জানালার বাইরে তাকালাম। মিন্টুকে দেখে আমার মনে হয় বিস্মিত হওয়ার যুগটাই বোধহয় আমাকে ফেলে অনেক পেছনে কোথাও হারিয়ে গেছে। বাইরে সন্ধ্যা নামছে। বসন্তের বাতাসমাখা সন্ধ্যা। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। বাসায় যাওয়া দরকার। মাথাটা ব্যথা করছে সেই দুপুর থেকে। সারা শরীরে ব্যথা হচ্ছে। ক্লান্ত পায়ে অফিস থেকে বের হয়ে পড়লাম।

চোখের পাতা আস্তে ফাঁক করে দেখলাম চারদিকে শুধু সাদা, দুধের সরের মতো সাদা। আবার চোখ বন্ধ করে ভেতরের অন্ধকারেই দৃষ্টি মেলে দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম আমি কোথায় অছি। মনে হচ্ছে শরীরের ওপর কেউ একটা ভেজা, ভারী বস্তা চাপিয়ে দিয়েছে। বস্তার চাপে আমি তলিয়ে যাচ্ছি আর খুব শীত করছে। দ্বিতীয়বার চোখ খুলে বুঝলাম জায়গাটা একটা হাসপাতাল। একটা লম্বা ওয়ার্ডের শেষ মাথায় দেয়াল ঘেঁষে আমার বেড। পায়ের কাছে খোলা একটা জানালা দিয়ে বিরক্তিকর একগাদা রোদ ভেতরে লাফিয়ে নামছে। এখানে কি করে এলাম কথাটা ভাবতে ভাবতে মাথাটা ডানদিকে ঘুরিয়ে দেখলাম ময়লা আর চলটা উঠে যাওয়া একটা স্টিলের ড্রয়ার কাম টেবিল বিছানার পাশে অবধারিত দাঁড়িয়ে আছে। সেটার ওপরে কয়েকটা কমলা আর পানির বোতল রাখা। হাসপাতালে আসার কারণটা নিয়ে আকাশ-পাতাল করার সময় একজন সিস্টার এসে দাঁড়ালো বিছানার পাশে। কর্কশ গলাটা শুনে ঘোরটা কেটে গেলো আমার। আসলে জ্বর হয়েছিলো দু'দিন আগে। এমন জ্বর আমার আগে কখনো হয়নি। কয়েক দিন ধরেই শরীরটা ঠিকমতো আচরণ করছিলো না। জ্বর আসার আগের দিন রাতে বাসায় ফিরেছিলাম প্রচন্ড মাথাব্যথা নিয়ে। ভোররাতে টের পেলাম সারা শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। তারপর আর কিছু মনে নেই। সিস্টার কি একটা ওষুধ খাইয়ে চলে যাবার সময় দুর্বল গলায় জানতে চাইলাম, সিস্টার আমি এখানে কতদিন ধরে আছি? মহিলা বেশ মোটা। চলে যাবার সময় ভারী শরীরটা ঘুরিয়ে বললো, তিন দিন। আপনার এক বন্ধু অপনাকে এখানে ভর্তি করেছে। খুব জ্বর ছিলো আপনার। ভাইরাল ফিভার। এখন নেই।

সিস্টার চলে যাবার পর ওয়ার্ডের চারপাশে ভালো করে তাকালাম। পাশের বেডটা খালি। তারপর থেকে পাঁচটা বেডের সবকটাতেই রোগী আছে। বিচিত্র ভঙ্গিতে সবাই শুয়ে আছে। কোন কোন বেডের মাথায় ফাঁসির দড়ির মতো স্যালাইনের নল ঝুলছে। অনেক সকাল বলে হাসপাতালের নরমাল হল্লা-চিল্লা এখনো শুরু হয়নি। একবার মনে হয়েছিলো সিস্টারকে বন্ধুর নাম জিজ্ঞেস করি। তারপর আবার মনে হলো এ শহরে আমার অসুখ শুনে দেখতে যাওয়া এবং হাসপাতালে নিয়ে আসার মতো লোক একজনই আছে। সে পারভেজ। এখন বিছানায় শুয়ে ব্যাটার আসার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই। চাদরের তলায় শরীরটা আবার ঘামে ভিজে গেছে। পায়ের ধাক্কায় চাদর সরিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আবার চোখ বন্ধ করলাম। শরীরে ভীষণ ক্লান্তি।

দুপুরবেলা হাসপাতালের রান্না কি যেনো একটা বিস্বাদ জিনিস নাকে-মুখে খেয়ে আবার ঘুমের ভেতর তলিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙলো বিকেলবেলা মাথার কাছে কথার আওয়াজে। চোখ খুলে পারভেজকে দেখে ভালো লাগলো। পারভেজের পাশে আরেকজনের মুখ দেখে আমি ধরমর করে বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করলাম। নাজনিন।

আরে আপনি, এখানে?

আমার প্রশ্ন শুনে নাজনিন হাসলো একটু।

আপনি আমাদের সবাইকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

পারভেজ আমার কপালে হাতের তালুটা ঠেকিয়ে বলে, তুই তো দেখি হেভি লম্পট। মহিলা দেখে আমার সঙ্গে আর কথাই বলছিস না।

কথাটা শুনে আমার খুব লজ্জা লাগলো। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম আমার লজ্জা পাওয়াটা খুব এনজয় করছে একপাটি স্যান্ডেলের মালিক, মানে নাজনিন। মাঝখানে আমাদের রেখে একটা ওষুধ আনার জন্য বাইরে গেলো পারভেজ। বিছানার পাশে দাঁড়িয়েই আছে নাজনিন। কয়েক মিনিট কাটলো কথা না বলে। আমি কেন জানি নাজনিনের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছিলাম না। এর মধ্যে নাজনিন কখন যেনো একটা কমলা ছিলে একটা কোয়া আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, নিন, জাদুকর সাহেব কমলা খান।

আমি হাত বাড়িয়ে কমলার কোয়াটা নিয়ে মুখে পুরে দিলাম। নাজনিন আরেকটা কোয়া পরিষ্কার করতে করতে বলে, আমাকে এখন একটা ম্যাজিক দেখাবেন?

কথাটা শুনে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম। তারপর একটু সামলে নিয়ে শরীরটাকে একটু ওপরে তুলে দিয়ে বললাম, আপনি দেখবেন আমার ম্যাজিক? একটা কয়েন ধার দিন।

নাজনিন কমলাটা রেখে ব্যাগ খুলে একটা কয়েন আমার হাতে দিলো। বাইরে বসন্তের বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার দিকে। হাওয়ার দাপটে জানালার পর্দাটা প্রবল বেগে উড়ছে। আমি লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে কয়েনটা ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে রেখে তুলে ধরলাম। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে

হাতটা শূন্যে ঘুরে এলো। মনে হলো সামনে কয়েক হাজার নাজনিন বসে আছে। স্পট লাইটের আলো পড়েছে আমার শরীরে। এক ঝাঁকুনিতে কয়েনটা জায়গা মতো চালান করে দিয়ে নাজনিনের সামনে শূন্য হাতটা আবার তুলে ধরলাম। কয়েক সেকেন্ড আমার চোখ স্থির হলো নাজনিনের চোখের ওপর। তারপর আবার নাজনিনের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে একটানে কয়েনটা বের করে নিয়ে এলাম ওর চুলের ভেতর থেকে। নাজনিনের দৃষ্টি বুকের ভেতরে যেনো হাজার ওয়াটের আলো জ্বালিয়ে দিলো। তখন চারদিকে বসন্তের বিকেলের সীমানা পেরিয়ে সন্ধ্যা নামছে।

সকালটা খুব সুন্দর। আমার সাবলেট রুমের জানালা দিয়ে একটু দূরে কলোনির মাঠ দেখা যায়। রোদে মাঠটা ঝকঝক করছে। শীতের সময় ছেলেদের ক্রিকেট খেলার দাপটে এখানে-ওখানে ঘাস উঠে গেছে। মাঠের পাশে দেয়াল ছুঁয়ে একটা বড় শিরীষ গাছ। পাতা ঝরে যাচ্ছে। সারা বছর গাছটার পাতা ঝরা, পাতা গজানো সবকিছু আমার চোখের সামনে ঘটে। খুব ভালো লাগে দেখতে। আমার ম্যাজিকের চেয়েও ব্যাপারটা বিস্ময়কর মনে হয়। বৃষ্টির মতো হুড়মুড় করে পাতা ঝরে গাছ খালি হয়ে যাচ্ছে আবার অন্যদিকে সবুজ পাতায় ভরে যাচ্ছে ডাল। হাসপাতাল থেকে গত সপ্তাহে বাসায় ফিরে এসে আর বাইরে যাইনি। প্রচন্ড জ্বরের ধাক্কায় শরীরটা এখনো দুর্বল। সকাল থেকে জানালার পাশে বসে গাছের ওপর রোদ আর বাতাসের নানা খেলা দেখা আর তাসের হাত সাফাই প্র্যাকটিস করা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। এর মধ্যে একদিন নাজনিন এসেছিলো পারভেজের সঙ্গে। খালা একগাদা খাবার রান্না করে পাঠিয়েছেন আমার জন্য। অনেক দিন এরকম ভালো রান্না খাওয়া হয় না। নাজনিন তুলে দিয়ে অনেক যত্নের সঙ্গে খাওয়ালো। ভালোই লাগছিলো ব্যাপারটা দেখতে। একদম সাজানো একটা ছবি। ওরা চলে যাবার পরও দৃশ্যটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। এরকম একটা দৃশ্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখলে খারাপ হতো না। আমি হয়তো কোনো শো শেষে অথবা অফিস থেকে বাসায় ফিরে আসবো রাতে। নাজনিন আমার জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকবে। আমি ঘরে ঢোকার পর সাবান আর তোয়ালে এগিয়ে দেবে। ফ্যান্টাস্টিক দৃশ্য। ভাবতে ভাবতে অনেক দূর গেলাম। আরো কি সব ভাবনা মাথার ভেতর ঢুকে পড়ছিলো। কিন্তু চিন্তাটাকে আটকে দিলো নাজনিনের ঠান্ডা চোখজোড়া। শীতের পুকুরের মতো চোখ। অর্ধেকটা কুয়াশার ভেতরে বাকিটা কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে। এরকম চোখের দিকে তাকালে ভাবনা-চিন্তা হারিয়ে যায়। শুধু একটা রহস্য তাড়া করে ফিরতে থাকে। নাজনিনকে হয়তো এসব কথা কখনোই বলা হবে না। তবে মাঝে মাঝে ভাবার জন্য এক একটা দিন আসে। আজ তেমনি আমার ভাবনার দিন। আমি ভাবতে থাকলাম।

এখন বসন্তের রাতগুলো বেশ ঠান্ডা। অফিসের কাজ শেষ করে অনেক রাতে বাসায় ফেরার সময় শীত লাগে। আমার অফিসটা খুব ঘিঞ্জি এলাকায়। রাত আটটায় কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার একটু পরেই দপ করে আলো চলে গেলো। লোডশেডিং। আমরা যে দু-একটা প্রাণী সেই দুপুর থেকে ছোট্ট ঘরটার মধ্যে মাথা গোঁজ করে কাজ করছিলাম তারা হঠাৎ ছাড়া পাওয়া পাখির মতো ফর ফর করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাইরের অন্ধকারে এসে দাঁড়ালাম। রাস্তার পাশে অফিসের উল্টো দিকে একসারি চায়ের দোকানে নক্ষত্রের মতো হ্যারিকেন জ্বলে উঠেছে। রিকশার বেল আর মানুষের খামোখা হৈ হল্লায় সরু রাস্তাটা সরগরম। পত্রিকার দুই রিপোর্টার জাফর আর বদরুল দোকানে সিগারেট কিনতে গেলো। আমি রাস্তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশভর্তি তারা জ্বল জ্বলে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। একদম শীতের আকাশ। আজ আর আলো জ্বলবে না মনে হচ্ছে। এখন প্রত্যেক দিনই নিয়ম বেঁধে এরকম হচ্ছে। শীতকালে এ ঝামেলা থাকে না। মেজাজ খারাপ লাগছে। পরশু পত্রিকা বেরুবে। মেকআপের কাজ কিছু বাকি আছে। কিন্তু আমার আর খাঁচাটার ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। সেই বেলা এগারোটায় এসে ঢুকেছি। কত কাজ করা যায়। মাসের দশ তারিখ পার হয়ে গেছে। শালাদের এখনো বেতন দেয়ার নাম নেই। বদরুল আর জাফরকে দোকানে রেখে আমি গলি বেয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। দু'পাশের বাড়িগুলোর জানালা থেকে মোমবাতি আর হ্যারিকেনের নানা মাপের আলো রাস্তায় পড়ে ঝিলিমিলি তৈরি করছে। কতক্ষণ কোন পথ দিয়ে হেঁটেছি মনে নেই। হঠাৎ চমক ভাঙলো নাজনিনদের বাসার গলির সামনে দাঁড়িয়ে। এখানে আলো আছে। স্ট্রিট লাইটের আলোয় মাথার ওপরের তারাভর্তি আকাশটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কখন যে হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছি নিজেই টের পাইনি। হাসি পেয়ে গেলো। পাগল-টাগল হয়ে গেলাম নাকি? ঘড়ির দিকে তাকালাম। নটার ওপরে বাজে। একবার মনে হলো যাই। নাজনিন নিশ্চয়ই এখন বসবার ঘরের খাটের ওপরে বসে পত্রিকা পড়ছে। এ সময় আমাকে দেখে নিশ্চয়ই চমকে যাবে। নাজনিনের ঠান্ডা চোখজোড়া সামনে ভেসে উঠতেই আবার মনে মনে দমে গেলাম। নাজনিন হয়তো দরজা খুলে আমাকে দেখেই বলে উঠবে, 'আপনি এ সময়ে, আজকে কি আমাদের ম্যাজিক দেখানোর কথা ছিলো?' কথাটা মনের ভেতর উঁকি দিতেই একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়লাম। শালা কি যে এক ম্যাজিকের পাল্লায় পড়ে গেছি। একবার ভাবি পারভেজকে ডেকে গোটা পরিস্থিতি আলোচনা করে যুদ্ধ জয়ের কৌশলপত্র তৈরি করবো। কিন্তু কোথায় যেনো আটকে যায় সবকিছু। এ বয়সে এসে আমার এ রকম প্রেমে পড়া কেউ মানতে চাইবে না। আবার না বলে যে থাকা যাচ্ছে না সেও একটা যন্ত্রণা। আমি নিশ্চিত জানি, নাজনিনকে সরাসরি কথাটা বলতে গেলে ও হেসে টেসে এমন একটা অবস্থা করবে যে আমাকে পালিয়ে আসতে হবে। চার অক্ষরের এই বাংলা শব্দটা আমাকে মহা জ্বালায় ফেললো।

আমি যাদের ফ্ল্যাটে সাবলেট থাকি তারা দু'জনেই সরকারি চাকুরে। স্বামী-স্ত্রী। ঘরের পিঠে ঘর বলে এই একজোড়া পাখির অনেক কিচিরমিচিরই আমার কানে আসে। অনেক সকালে এরা দুজন ঘুম থেকে ওঠে। খুটুর-মুটুর শব্দে আমাকেও উঠতে হয়। মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত লাগে। সকালবেলার ঘুমটা আমার খুব প্রিয়। সকাল দশটা পর্যন্ত বিছানায় আড়মোড়া দিতে দিতে মনে হয় সমুদ্রের বুকে আমি যেনো ভেসে চলা একটা নৌকা। ভেসে যাচ্ছি। কখনো ঢেউ এসে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছি। প্রায় প্রতিদিনই আমার সমুদ্রযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায় এই যুগল। নাকে-মুখে তৈরি হয়ে এরা বেরিয়ে যাবার পর আবার আমি নিজেকে সমর্পণ করি ঘুমের কাছে। ঘুম আমার বন্ধুর মতো। সকল শঙ্কা, সকল টেনশন থেকে আমাকে মুক্তি দেয় ঘুম। মানুষ ঝামেলায় থাকলে শুনেছি নির্ঘুম রজনী অতিবাহিত করে। আমার আবার এসবের বালাই নেই। মাথার ভেতরে হয়তো ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কুছ পরওয়া নেই। বাসায় ফিরে বিছানায় শুয়ে আমি ঘুমের সমুদ্রে ডুবে যেতে পারি। আজ কিন্তু পাশের ঘরে পাখিদের অন্যরকম কিচিরমিচির শুনে ঘুম এলো না। এরা দু'জন কোথায় যেনো বেড়াতে যাবে। তারই আয়োজন চলছে। দেয়াল ভেদ করে কথার সঙ্গে যুগলের ভারী, ঘন নিঃশ্বাসও কখনো আমি শুনি। আমার মনেই ছিলো না আজ শুক্রবার। ছুটির দিন। অফিস না থাকলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মহা উৎসাহ নিয়ে বেড়াতে বের হয়ে যায়। আর সন্ধ্যাবেলা ফিরে আমাকে ঘরে পেলে বেড়ানোর গল্প শোনায়। আগে এসব সাংসারিক ঘাসপাতা মার্কা বেড়ানোর গল্প শুনতে ভালো লাগতো না। নাজনিনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে দেখলাম গল্পগুলো ভালো লাগতে শুরু করেছে। নিজের মাথার ভেতরে নানা চিত্রনাট্যও ডালপালা বিস্তার করছে। বইতে পড়েছি এরকম হওয়ার কথা। শুক্রবার সাপ্তাহিক পত্রিকায় কোন কাজ থাকে না। আমি ছাড়া অফিসের বাকি আদমিরা বিয়ের কারবারটা সেরে ফেলেছে। ফলে সবাই ব্যস্ত। বিকেলের দিকে আমিই মাঝে মাঝে অফিসে যাই, সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকি একা, পত্রপত্রিকার পাতা ওল্টাই। তারপর এক সময় হাঁটতে হাঁটতে আবার ঘরে। কিছুই করার নেই। পারভেজও শুক্রবারে বউ, বাচ্চাদের সময় দেয়। আজও দিনটা কিভাবে কাটাবো ভেবে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। পাশের ঘরের বাসিন্দারা বেরিয়ে যাওয়ার পর উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে দেই। ঘরের ভেতরে প্রায় আছড়ে পড়লো একগাদা রোদ। বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এলো। রোদের তেজ দ্রুত বাড়ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়লো আগামী সপ্তাহে একটা শো আছে মতিঝিলে এক অফিসের বার্ষিক ফাংশানে। কয়েকটা নতুন ম্যাজিক দেখাবো। একটু প্র্যাকটিস করা দরকার। কিন্তু কিছুই করতে ভালো লাগছে না। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, আমার এখন নাজনিনকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে। কোথাও একটা। যেখানে বসন্তের রোদ পড়ে একটা শুকনো নদী তলোয়ারের মতো ঝকঝকে হয়ে আছে, যেখানে গাছ থেকে

হাজার হাজার পাতা ঝরে পড়ে পুকুর হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে খুব রাগ হয়ে গেলো। কেন হলো নিজেও ঠিক বুঝলাম না। মনে হলো কে যেনো আমার অবস্থা দেখে দাঁত বের করে হাসছে। রাগটা আমাকে ঠেলে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলো।

বাতাসের ধাক্কায় ছেঁড়া ঠোঙ্গার মতো অনেকক্ষণ শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। শুক্রবার থিকথিকে ভিড় থাকে না ঢাকায়। রাস্তায় বাস, গাড়ি দ্রুত চলাচল করে। অনেক দিন ময়লায় জ্যাম হয়ে থাকা ড্রেন পরিষ্কার হলে পানি যেমন দ্রুত গড়ায় অনেকটা সেরকম। হাঁটতে হাঁটতে নারিন্দার ক্রিশ্চিয়ান কবরস্থানের গেটে পৌঁছানোর পর পেটে টান পড়লো। মানুষের বোধহয় এই এক সমস্যা। ক্ষুধা পেলে সব রাগ, আনন্দ উবে যায়। জেগে থাকে শুধু প্রবল পরাক্রমশালী ক্ষুধা। টিপু সুলতান রোডের একটা হোটেলে ভাত খেতে খেতে মাথা ঠান্ডা হয়ে এলো। হোটেল থেকে বের হয়ে একটা পান কিনে রিকশায় উঠে পড়লাম। হোটেলে বসেই ঠিক করেছি নাজনিনদের বাসায় যাবো। এভাবে খামোখা নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। একবার দেখা করে আসাই ভালো। নাজনিন নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেনা। আমি তো আর প্রেম নিবেদন করতে যাচ্ছি না। দেখা করতে যাচ্ছি।

ঝামেলা হলো রিকশা নিউমার্কেটের কাছে পৌঁছতে। রাস্তা ফাঁকা ছিলো বলেই বোধহয় ঘটনাটা চোখে পড়লো। বলাকা সিনেমা হলের সামনে বেশ ভিড়। বোধহয় নতুন ছবি রিলিজ পেয়েছে। এ পাশে নিউমার্কেটের গেটে কয়েকটা খালি রিকশা ঝালমুড়িওয়ালাকে ঘিরে দাঁড়ানো। বলাকার দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে এ পাশে তাকানোর সময় হঠাৎ দেখি নাজনিন রিকশায় ওঠার চেষ্টা করছে আর একটা লোক পাশে দাঁড়িয়ে হাত টেনে ধরে বাধা দিচ্ছে। আমি ঘটনাটা বুঝে ওঠার আগে আমার রিকশা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলো। চলন্ত রিকশা থেকে প্রায় লাফিয়ে নেমে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি নাজনিন রিকশায় উঠে বসেছে আর লোকটা এবার ওর পাশে বসার চেষ্টা চালাচ্ছে। দুজনের হৈ চৈ আর টানটানিতে চারপাশে লোক জমা হয়ে গেছে। এসব ঘটনায় দর্শকরা হলো গুড়ের মাছির মতো, সহজে সরানো যায় না। আমি টের পেলাম সকালের রাগটা প্রচন্ড ঘূর্ণির মতো আমার ভেতরে আবার ফিরে আসছে। নাজনিনের পাশ থেকে লোকটাকে টেনে নামাতে বেশি সময় লাগলোনা। আমার প্রথম ঘুষিটা লোকটাকে ভিড়ের গায়ে ছিটকে ফেলে দিলো। লোকটা বাতাসে দু'হাত পাখির মতো মেলে দিয়ে ব্যালান্স সামলানোর চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আমার লাথিটা তাকে মাটিতে পড়তে বাধ্য করলো। রিকশায় বসে চিৎকার করে উঠলো নাজনিন।

প্লিজ, মারবেন না। ওকে মারবেন না।

আমি খুব অবাক হয়ে তাকাই নাজনিনের দিকে। মেয়েটা বলছে কি। প্রচন্ড রাগে লোকটাকে শার্টের কলার ধরে আবার টেনে তুলতে যেতেই নাজনিন প্রায় ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরলো। ওর চোখে চোখ পড়তে বিস্মিত হলাম আমি। মেয়েটা ভয় পেয়েছে। আমার হাতের মুঠি আপনাতেই কেমন আলগা হয়ে গেলো। নাজনিন একটু কেঁপে যাওয়া গলায় বললো, কেন পাগলামি করছেন, ছেড়ে দিন। হিরো হবার চেষ্টা করবেন না।

নাজনিনের দৃষ্টি, কথা, চারদিকে উত্তেজিত মানুষের ভিড় আমাকে কনফিউজ করে দিলো। আর এই কনফিউশনটা আমাকে যেনো ঠেলে বের করে দিলো গোলমালের কেন্দ্র থেকে। আমার বোকা দৃষ্টির সামনে নাজনিন লোকটাকে টেনে রিকশায় তুলে নিয়ে আমার সামনে দিয়ে চলে গেলো। গুড়ের ওপর মাছির মতো ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষগুলোও হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো চারধারে। দু-একটা সরস মন্তব্যও উড়ে এলো আমাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সেগুলো তখন কিছুই আমার কানে ঢুকছে না। আমি দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হয়ে বলাকা হলের সামনের ভিড়ে মিশে গেলাম।

বেশি টেনশনে থাকলে আমার সব সময় ভালো ঘুম হয়। ঘরে ফিরে বোকার মতো কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থাকলাম। একসময় টের পেলাম ভেতরের রাগ পড়ে গিয়ে তার জায়গা দখল করেছে কষ্ট। নাজনিন আমাকে ওরকম কথা না বললেও পারতো। আমি তো নাজনিনের বিপদ ভেবে এগিয়ে গিয়েছিলাম। হিরো সাজার কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলার কোনো কৌশল জানা থাকলে তখন আমি তাই করতাম। আসলে আমি কি চেয়েছিলাম? নাজনিনের প্রশংসাধন্য দৃষ্টি? নিজেকে তখন কি ভাবতে চেয়েছিলাম আমি? রবিনহুড? জীবন আসলে একটা গল্প, ফ্যান্টাসি? বিছানায় শুয়ে শুয়ে গত কয়েক দিনে আমার মানসিক পাগলামিটা সিনেমার মতো চোখের সামনে ভেসে উঠলো। হাসিই পেলো চোখের সামনে নিজেকে প্রেমিক হিসেবে দেখতে। আবার মনের ভেতরে নাজনিনকে নিয়ে ভালোলাগার অনুভূতিটা টের পেয়ে নিজের জন্যও মায়া লাগলো। এতোকাল পরে এরকম একটা অনুভূতির অপমৃত্যু ঘটবে শেষ পর্যন্ত। শুয়ে থেকে এসব আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখের পাতা লেগে এসেছে টেরই পাইনি। ঘুমিয়ে পড়ার আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে নাজনিনদের বাসায় যাবো। গোটা ঘটনাটার একটা ফয়সালা করা দরকার। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর দৃশ্যপট বদলে গেলো। আমার পাশের ঘরের বাসিন্দারা তখন অফিসে চলে গেছে। একবার ভেঙে যাওয়ায় আর ঘুম এলো না। হঠাৎ দরজায় টোকা শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায়। আমার কাছে তো এতো সকালে কেউ আসে না। দরজা খুলে দেখি নাজনিন দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাসিটা দেখে মনেই হলো না কালকে এতোবড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

ভেতরে আসার অনুমতি দেবেন না?

নাজনিনের কথা শুনে থতমত খেয়ে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম। ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে পড়ে নাজনিন। খুব গুছিয়ে ধূসর আর কালোয় মেলানো একটা সুতির শাড়ি পরেছে নাজনিন। সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি একবার তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকলাম।

কি, আমাকে দেখে খুব রাগ হচ্ছে না? বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করবো না। এখনই চলে যাবো। টের পেলাম নাজনিনের কথা শুনে ভেতরের কষ্টটা আরেক ডিগ্রি বেড়ে গেলো।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবারও কথা বলে নাজনিন।

আমার সঙ্গে কথা বলবেন না? আমারও তো কিছু বলার থাকতে পারে। আপনি আমার কথাগুলো শুনলে খুব খুশি হবো।

আমি নিঃশব্দে দরজাটা টেনে দিয়ে নাজনিনের সামনের চেয়ারটাতে বসলাম। ঘরের ভেতরে কয়েক সেকেন্ডে জমে ওঠা নৈঃশব্দের পাহাড় ভেঙে দিয়ে হঠাৎ কথা বলে ওঠে নাজনিন।

আপনি আমার সম্পর্কে ঠিক কি ভেবেছেন জানি না, তবে মনে হয় যা ভেবেছেন তা ঠিক নয়। আমি জানি কেন কালকে আপনি ওরকম করেছিলেন।

নাজনিনের কথা শুনে চমকে মাথা তুলে তাকাই। নাজনিন মিষ্টি করে হেসে বলে, কি, চমকে দিলাম আপনাকে? আসলে আমি আর দশটা মেয়ের মতো না। আপনি জানেন আমার বাবা নেই। টিউশনি আর ছুটকা কাজ করে আমি সংসার চালাই। কিন্তু আমার কাজটা কি আপনি জানেন?

আমাকে কোনো কথা বলতে না দেখে ব্যাগ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে

খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরায় নাজনিন। তারপর আমার বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব ঠান্ডা গলায় বলে, প্রস্টিটিউশন।

গভীর রাতে জাহাজের মতো ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে যেনো ধাক্কা খেলাম আমি। বিশাল পাথর খন্ডটা সবকিছু ভেঙে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। টের পেলাম শরীরে কোথাও কাঁপুনি তৈরি হচ্ছে। বিছানার ওপর আর বসে থাকতে পারছি না। আমি অনেক কষ্টে তাকালাম নাজনিনের দিকে। সেই ঠান্ডা, স্থির দৃষ্টি। নাজনিন আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলে, আমার সঙ্গে কালকে যে লোকটাকে আপনি মারলেন সে আমার দালাল। তাকে বাঁচানোটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ব্যবসা নষ্ট করতে কে চায় বলেন? আমিও চাইনি। আমার কথাগুলো আপনাকে জানানো প্রয়োজন ছিলো। আসলে আপনি যে খুব ভালো মানুষ।

নাজনিন আর কতক্ষণ বসে ছিলো বলতে পারবো না। ওর হাতের জ্বলে ছাই হতে থাকা সিগারেটের গন্ধটা শুধু আমার ঘ্রাণ শক্তিকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিলো। চলে যাবার সময় নাজনিন দরজার কাছে একবার দাঁড়ায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে বলে, আপনি আসলে ভালো ম্যাজিশিয়ান না। খুব সহজেই চমকে গেলেন।

আমি মাথা তুলে বাইরের দিকে তাকালাম। নাজনিন চলে গেছে। দূরে শিরীষ গাছটা থেকে এখনো পাতা ঝরে যাচ্ছে। আজ বোধহয় বসন্তের শেষ তারিখ। ■